দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

৮ | সম্পাদকীয়

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্র চর্চার এ কী হাল

অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য যে, গত এক যুগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের কোনো অধিবেশন বসে নাই। এই এক যুগে সিনেট কর্তৃক মনোনীত নয় এমন পাঁচজন উপাচার্য নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। বদল হইয়াছে একাধিক সরকারও। এই সময়কালে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার তাহাদের মেয়াদকাল পূর্ণ করিয়াছে। গত হইয়াছে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাল। সর্বশেষ মহাজোট সরকারের মেয়াদকালও সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ লঙ্ঘন করিয়াই চলিতেছে এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়টির গুরুত্বপূর্ণ সকল কার্যক্রম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রও খুব একটা ভিন্ন নহে। বেশ কিছুদিন যাবৎ সিনেট নিষ্ক্রিয়। ইতিমধ্যে নির্বাচিত সদস্যদের মেয়াদকাল শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সিনেট পুনর্গঠনের উদ্যোগও দৃশ্যমান নহে। অথচ ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী উপাচার্য বৎসরে অন্তত একবার সিনেটের সভা ডাকিবেন, যাহা বার্ষিক সাধারণ সভা হিসাবে অভিহিত হইবে। উপাচার্য নির্বাচন, নূতন বিভাগ খোলা, বাজেট অনুমোদন ও আইন সংশোধনসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সিনেট কমিটিতেই হওয়ার কথা। অধ্যাদেশে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, সিনেট কর্তৃক মনোনীত তিন সদস্যের একটি প্যানেলের মধ্য হইতে চ্যান্সেলর উপাচার্য নিয়োগ প্রদান করিবেন। কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত একযুগ ধরিয়া এই নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়া আসিতেছে। উপাচার্য নিয়োগে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানো হইয়াছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও। একই সাথে সিনেট ছাড়াই চলিতেছে বাজেট অনুমোদন। আবার সকল প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও সিনেটের অধিবেশন না বসিবার কারণে নূতন কোর্স চালু করা সম্ভব হইতেছে না রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে নিয়মনীতির প্রতি এই অবজ্ঞা এবং সর্বোপরি গণতন্ত্র চর্চার এই হাল দুর্ভাগ্যজনকই শুধু নহে, অনভিপ্রেতও বটে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে প্রণীত ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশটি বাতিল করার চেষ্টাও হইয়াছে বিভিন্ন সময়ে। কারণ এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও স্বশাসন নিশ্চিত করা হইয়াছে। সুরক্ষা দেওয়া হইয়াছে সর্বপ্রকার অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ হইতে। সঙ্গত কারণেই সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই অধ্যাদেশ বাতিল করার সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। অধ্যাদেশটি কতোখানি গণতান্ত্রিক, জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও সুচিন্তিত সিনেটের গঠন প্রকৃতির দিকে তাকাইলেই তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। লক্ষণীয় যে, সিনেটের মোট সদস্যসংখ্যা ১০৪। তন্মধ্যে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়াও আছেন সরকারের মনোনীত ৫ জন সরকারি কর্মকর্তা, স্পিকার কর্তৃক মনোনীত ৫ জন সংসদ সদস্য, চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ৫ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের ৫ জন প্রতিনিধি, একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত বিভিন্ন কলেজের ৫ জন অধ্যক্ষ, একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ১০ জন কলেজ শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের দ্বারা নিজেদের মধ্য হইতে নির্বাচিত ২৫ জন প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত ৩৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি এবং ছাত্রদের দ্বারা নির্বাচিত ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধি। অতএব, ইহা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, সিনেটে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমাজের সর্বস্তরের মেধা ও অভিজ্ঞতার যেই দুর্লভ সমাবেশ ঘটানো হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চমাত্রার সৃজনশীল ও জ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠানকে পথনির্দেশনা প্রদানের জন্য ইহার চাইতে মূল্যবান সম্পদ আর কিছুই হইতে পারে না। এই সম্পদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন শুধু যে অভ্যন্তরীণ সুশাসন ও গণতন্ত্র চর্চার জন্যই ক্ষতিকর তাহা নহে, সামগ্রিকভাবে ইহা নিজের পায়ে কুড়াল মারার শামিল বলিয়া আমরা মনে করি।

ভাবিতে অবাক লাগে যে, যেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একদা আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামে ও মুক্তিযুদ্ধে বীরোচিত ভূমিকা রাখিয়াছে এবং পথিকৃতের ভূমিকা পালন করিয়াছে স্বৈরাচারবিরোধী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, সেইসব প্রতিষ্ঠানেই আজ নিয়ম-নীতি ও গণতন্ত্রের চর্চা উপেক্ষিত হইতেছে নিদারুণভাবে। গণতন্ত্রকে টিকাইয়া রাখিতে নিরন্তর সংগ্রামরত একটি জাতির জন্য ইহা মোটেও ভালো দৃষ্টান্ত নহে। সিনেটকে অবশ্যই সচল করিতে হইবে। সর্বোপরি গণতন্ত্র, সুশাসন ও ন্যায়নীতি চর্চার ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বাতিঘর হিসাবে কাজ করিবে—ইহাই প্রত্যাশিত।